চোরাকুঠরির বাসিন্দা

কামাল হোসেন

'তোমার চোখের চাউনিটা বড়ো খারাপ।'

'বটে।'

'অমন প্যাট প্যাট করে মেয়েছেলের বুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে আছে।'

'আহা– দেখবার জিনিস, দেখব না?'

'কী কথাটাই বললেন উনি। কেন দেখবার কি কিছুই নেই চারপাশের পৃথিবীতে?'

'আছে। আকাশ, পাহাড়, নদী, সমতলভূমি।'

'তাহলে?'

'তুমি এত নিষ্ঠুর কেন নারী?'

'তাই বুঝি?'

'সে কখন থেকে পথ চেয়ে বসে আছি। এতক্ষণ বাদে জল নিতে আসলে!'

'ওমা, আমার রসের নাগর কেষ্ট ঠাকুরের কী দুঃখু– কী দুঃখু...' জল নেবার জন্য টিউকলের সামনে দাঁড়িয়ে লাল শাড়ি হাসতে হাসতে ঢলে পড়ে সবুজ শাড়ির গায়ের উপরে। হয়ত এরকম বা অন্য কোনো ভাষায়– অন্য প্রসঙ্গের রঙ্গ-রসিকতায় মেতে ওঠে লাল শাড়ি...খুব চেনা সংলাপও তখন অচেনা ঠেকে দিলীপের কাছে।

বেলা বোধহয় অনেক হল। রোদ বেশ চড়া। বাগানে সান্টুদার সঙ্গে ঘাস পরিষ্কার করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় দিলীপ। মেয়েমানুষরা কি খুব নিষ্ঠুর? সবসময় ওদেরকে কেন এক দূর কোনো ভিনদেশী গ্রহের প্রাণী বলে মনে হয়?

সান্টুদা রোজকার মতো একবার জিজ্ঞেস করে, 'একটা সামান্য কাজ করতে এত সময় নাও কেন বাবা? সবসময় মনে হয় নেশা - ভাঙ করে ধুমকিতে আছো। চোখে - মুখে ঘুমঘুম ভাব।'

এসব কথা শুনলে কার না মেজাজ খারাপ হয়? মগজের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে দিলীপ। ইচ্ছে করে, এক ঘুঁষি মেরে সান্টুদার থোবড়া বিলা করে দেয়। ...কত কষ্ট করে যে নিজেকে সংযত করতে হয়...

'ছোড়দা, তুই কিন্তু শান্তভাবে থাকবি।'

'আমাকে এখানে তোরা একা ফেলে রেখে দিবি প্রদীপ?'

'উপায় নেই রে ছোড়দা। তবু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া গেছে...

'তোরা কলকাতায় কত সুখে থাকিস।'

'কোনো উপায় নেই। কেন নেই– সেটাও তুই জানিস ভালো করে।'

'আমার অসুখটার জন্য কি আমি দায়ী?

'কে বলল? অসুখ হওয়াটা দোষের কিছু না। কিন্তু এতগুলো বছরে তো দেখলাম আমরা। প্রত্যেক বছরে ঘুরে ঘুরে অসুখটা আসে। তুই ডাক্তারদের কথা শুনিস না। ঠিকমতো ওষুধ খাস না।'

'ভালো লাগে রোজ শালা ওষুধ গিলতে? ডাক্তারগুলোও সব এক-একটা হারামজাদা। অসুখ ভালো করতে পারে না, সারা বছর ওষুধ গেলাবে। সবই বুঝি, ওষুধ, দোকানগুলোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র আছে। নির্ঘাৎ কমিশন পায়।'

'কী-সব উল্টোপাল্টা বকছিস ছোড়দা। তোর রোগটাই তো আলাদা ধরনের। নিয়মিত ওষুধ না খেলেই তুই আলাদা মানুষ।'

'আর মানুষ বলবি না। জন্তু-জানোয়ার বল। লোকে পোষা জন্তুকেও কত ভালোবাসে। আর তোরা– আমার মায়ের পেটের ভাই, নিজেরা কত ফুর্তি -আমোদ করে, বউ-বাচ্চা নিয়ে হৈ -হুল্লোড় করে প্রেমসে দিন কাটাবি, আমি শালা এই পিঁজরাপোলে মাথা গুঁজে ভিখিরির মতো শুধু দিনরাত্রি গুণে যাব।'

'দুঃখ করিস না ছোড়দা, তোর অসুস্থ হবার সময় ভায়োলেন্ট চেহারাটা তো নিজে বুঝতে পারিস না। ইট্স এ হরিবল এক্সপিরিয়েন্স।'

'প্রদীপ, বড়দা - মেজদা না হয় অনেক বড়লোক, ওদের স্টেটাস আলাদা, বউদিরাও বড্ড দেমাকী। প্লিজ, তোর কাছে আমার থাকার ব্যবস্থা কর। কথা দিচ্ছি, নো গন্ডগোল রেগুলার ওষুধ খাব। সেই কালো মোটা ডাক্তারটা যা বলবে, সব শুনব।'

'আর যে হয় না রে ছোড়দা। শিপ্রা তোকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। আগেরবার– আমার কাছেই তো ছিলি। বাট ইউ অ্যাটেম্পটেড চু মলেস্ট হার। আমি জানি, তুই অসুস্থ মানুষ, ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু শিপ্রা? লাইফে আর তোর মুখ দেখবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।'

ঘাসগুলো পরিষ্কার করতে করতে মাথা উঁচু করে টিউকলের পাশটা একবার দেখে নেয় দিলীপ। লাল শাড়ি নেই। কখন শালা কেটে পড়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে গেলে কী ক্ষতি হত তোমার? আমি কি তোমাকে ছিঁড়ে খেতাম? শুধু একটু চোখ মেলে দেখি আর মনে মনে কল্পনার সংলাপ সাজাই। এছাড়া আর কীভাবেই বা বেঁচে থাকি বল? এই বোবা আর কালাদের আশ্রম, এখানে পরিচিত শব্দের আনাগোনা নিষিদ্ধ। এই নিঝুম পাষাণপুরীতে কোথাকার রাজকন্যে তুমি সখীদের নিয়ে এসে ভিড় করো টিউকলের পাশটিতে। তারপর কল কল করে কত কথা, কত উচ্ছ্বাস আর হাসি ঠেউ।

পেট্রোল পাম্পের মালিকটা ছিল খুব খচ্চর। ভেবেছিল, পাগল-ছাগল মানুষ, একমুখ দাড়ি, ছেঁড়া জিনসের প্যান্ট, কালো রঙের গেঞ্জি,

ব্যাটাকে মিনি মাগনা খাটিয়ে নেওয়া যাবে। বছর পাঁচেক আগের ঘটনাগুলো ভাবলে মাঝে মাঝে বেশ কৌতুক অনুভব করে সে। তার কদিন আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিল। বড়দার দাবা খেলার ঘুঁটিগুলোকে লাথি মেরে ছত্রখান করে দিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, বড়দার মতো একজন সফল মানুষ যখন পাইপ টানতে টানতে একা একা দাবা খেলে, দিলীপের মাথায় তখন খুন চেপে যায়। ওরকম সুখী এবং বিলাসী মানুষের মুখের সামনে বিদেশি দাবার বই দেখে সাজানো ছকের উপর সপাটে একখানা লাথি মারার মধ্যে যে প্রবল প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ঝংকার লুকিয়ে আছে, ভাবতে গেলে এখনো দিলীপের বুকের ভিতরটা শির শির করে ওঠে বইকি!

তো সেই পেট্রোল পাম্প। তার মালিক ঢোলগোবিন্দবাবু। এক মাস কাজ করার পর, পেটে-ভাতের ব্যাপারটা ছিল। অবশ্য, মাইনে চাইতে গেলেই কী তার খিস্তি। না– ওসব মাইনে ফাইনে হবে না। ওসব তো কিছু চুক্তির মধ্যে ছিল না। বিশাল মোটা ফরসা ঢোলগোবিন্দবাবু খ্যা খ্যা করে হেসে বলেছিল, 'পালা শালা। ভাত ছিটোলে কাকের অভাব হয় না। শালা মাইনের কথা বলছিস। ভাগ্ এখান থেকে।'

হোস পাইপের মতো পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল মাঝরাত্রিরে ছড়িয়ে দিয়েছিল সে। তারপর একটা ম্যাচিসের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ। উঃ–মাঝরাত্রিরে ডিসেম্বরের শীতে একটা জলজ্যান্ত পেট্রোল পাম্পভর্তি আগুন– কী দুর্ধর্ষ দৃশ্য। কত গরীব-গুর্বো শীত পোহাতে পারবে। ইট্স আ রেভোলিউশান– বিপ্ বিপ্ বিপ্লব– শালা ঢোলগোবিন্দর চর্বি ঠাসা ভুঁড়ি লক্ষ্য করে ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই...

সেই জঘন্য শ্রেণিশত্রুটাকে কি শেষ পর্যন্ত সত্যি মারতে পেরেছিল দিলীপ? কিংবা পেট্রোল পাম্পে জ্বলন্ত আগুন? নাকি সবটাই তার নিছক কল্পনা– ইচ্ছে পূরণের গল্প সাজানোর খেলা? বড়দার টেবিলের উপর সাজানো দাবার ছক লাথি মেরে ফেলে দেওয়া– সবই তাহলে মনে মনে নিজের মতো খেলে যাওয়া? তা-ই বা হয় কী করে, তাহলে প্রদীপ কেন বলে তার বউ শিপ্রার উপর সে ধর্ষন করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? শিপ্রাকে তার খুবই ভালো লাগে, কী সুন্দর আকর্ষণীয় চেহারা, যেমন বুক তেমনি পাছা, মনে মনে কতবার তাকে সে রেপ করেছে, তার জন্য তার কোনো অপরাধবোধ নেই, কিন্তু ব্যাপারটা যতদূর মনে হয় সমস্তটাই কল্পনা, নিছক অবসর বিনোদন। বাস্তবে সে চিরকালই খুব ভীরু ও কাপুরুষ, তার নিজের পক্ষে সম্ভব নাকি প্রদীপের বউকে রেপ করা? অদ্ভুত, সবকিছুই ভারি অদ্ভুত লাগে তার কাছে।

সান্টুদা ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বলে, 'নেশা করবে, গাঁজা খাবে। রাজা নেশা। জয় বাবা ভোলানাথ।' কপালে দু-হাত ঠেকায়।

দেখাদেখি দিলীপও কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার জানায় বাবা ভোলানাথের উদ্দেশে। কতদিন ইচ্ছে ছিল পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে কাঁধে বাঁক নিয়ে তারকেশ্বর যাবে... ভোলে বাবা পার করেগা... মনে হয় এক স্বপ্নের উপত্যকা বেয়ে অমরাবতীর সদর দরজায় পৌঁছে কড় নাড়া...ধূ ধূ মরুভূমি পেরিয়ে পাহাড় আর ঝরনার পাশাটিতে বসে আপন বিলাসিতায় গাঁজার কলকে হাতে বিচিত্র রঙিন এক অনুভবে হারিয়ে যাওয়া...

'গাঁজা খেতে মন্দ নয়। তবে নিয়মিত ভালো লাগে না। তার বদলে ট্যাবলেট গেলো। চোখ দেখলে ঠিক বুঝতে পারি। গুলিখোরদের আমি মোটেই পছন্দ করি না। ড্রাই নেশা করবে, গাঁজা খাবে।'

মুগ্ধ চোখে সান্টুদার দিকে তাকিয়ে থাকে সে। এইসব মহান দার্শনিক চিন্তাভাবনার গাছপালা লতাগুল্ম ছুয়েই তো বেঁচে আছে মানবসভ্যতা ও তার বিচিত্র আয়োজন।

সান্টুদা তাঁর প্রাজ্ঞ দরদী গলায় বলে চলে, 'গাঁজা খাবে, তার সঙ্গে একটু দুধ খাবে। নইলে বুকে দম পাবে কী করে!'

আর গাঁজা, আর দুধ! প্রদীপটা এত হাড় কন্জুষ, হিসেবের কড়ির বাইরে এক পয়সা একস্ট্রা দেয় না। শালা জরু কা গুলাম! এক পুরিয়া গাঁজা কিনতে হলেও লোকের কাছে আজ হাত পাততে হয়। ইজ্জৎ কা সওয়াল। ভাবলে মেজাজটা খারাপ হয়ে যাওয়া কি অন্যায়? আমি একটা কমার্স গ্রাজুয়েট ছেলে, দু-তিন জায়গায় চাকরিও করেছি, মাসের প্রথমে কড়কড়ে নোট পকেটে ঢোকানোর অভিজ্ঞতাও আছে, আর আছে, আর আজ এই বোবা-কালাদের আশ্রমে মুখ গুঁজে থাকা পোষায় কখনো? দু-সপ্তা অন্তর প্রদীপ আসবে, প্রয়োজনীয় তেল, সাবান, টুথপেস্ট কিনে দেবে, একমাস অন্তর ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে যাবে, ওষুধ পত্তরের ব্যবস্থা করবে– ব্যাস, খেল খতম, পয়সা হজম। কতবার প্রদীপকে বলেছে, বাপের সম্পত্তির কিছুটা অংশ যদি পাওয়া যেত। তাহলে ইচ্ছেমতো সাধ মিটিয়ে অল্পস্বল্প খরচ-খরচা চালানোর জন্য কারোর কাছে হাত পাততে হত না। প্রদীপ নাকি বড়দা - মেজদার কাছে কথাটা একবার তুলেছিল। বড়দা গম্ভীর মুখে চুরুট টানতে টানতে বলেছে, 'মনে হচ্ছে ম্যানিক স্টেটের দিকে যাচ্ছে। টাকা-পয়সার কথা যখন বলছে, শিগ্গির ড. সান্যালের কাছে নিয়ে যা–'

মেজদা বলেছে, 'সেয়ানা পাগল। বাপের সম্পত্তির ভাগ চাইতে এসেছে। এতবার নার্সিংহোমে ভর্তি হলি, এতবার ডাক্তার দেখানো হয়েছে, ওষুধপত্র খরচ– সব একসঙ্গে যোগ করলে বাপের প্রপার্টি কবে ফাঁকা হয়ে যায়, সে খেয়াল আছে?'

সুতরাং সদানন্দ আশ্রমেই তোমার জীবনের জমা-খরচের হিসাব কষে যেতে হবে হে দিলীপবাবু। মাঝে মাঝে আস্তিন থেকে মেসিনগান বের করো, তারপার ঠাঁই ঠাঁই ঠাঁই, এক অমানুষিক ও ভয়ংকর গর্জনের মধ্যে এক তীব্র আর্ত চিৎকার। তখন ধন্দ জাগে, কেউ কি সত্যি সত্যি মার্ডার হয়ে গেল তার মেসিনগানের গুলিতে?

'কেমন আছ বাবা দিলীপ?'

সৌম্যকান্তি মাধবানন্দ মহারাজ কখন বাগানে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করেনি সে। হাত তুলে নমস্কার জানায়।

'কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

মাথা নাড়ে সে।

'ওষুধ-বিসুধ ঠিকমতো খাচ্ছ?'

আবার সে মাথায় নাড়ে।

'ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকলে সবরকম ব্যাধিরই উপশম সম্ভব। তুমি রোজ সন্ধ্যোবেলায় আমাদের প্রার্থনা ঘরে আস না কেন? মনে শান্তি

পাবে।'

মহারাজের দীর্ঘ বিশাল শরীরের দিকে তাকিয়ে এমনিতেই একটু হীনম্মন্যতায় ভোগে সে। একটা নির্জন পাহাড়তলির পথ ধরে তখন দৌড়ে ছুটে পালাতে ইচ্ছে হয়। ছমছমে স্তব্ধতায় মাধার উপরে উড়ে যায় আফ্রিকার আদিম দুর্গম অরণ্য থেকে উড়ে আসা রহস্যময় রক্তপিপাসু এক ভ্যাম্পায়ার।

স্নান-খাওয়াদাওয়ার পর ওষুধ খেয়ে এক ঘুম। তারপর বিকেল।

খেলার মাঠে একপাশে চুপচাপ সে বসে থাকে। দুপুরের ওষুধের আচ্ছন্নভাব অদ্ভুত একটা ঘোর এনে দেয়। আশ্রমের আবাসিক ছেলেরা ফুটবল খেলে। কোনো রেফারি নেই। কোনো আওয়াজ নেই। এক শব্দহীন নিথর জগতে খেলা করে স্বর্গের দেবশিশুরা। বিধ্বস্ত দিলীপ অবাক চোখে বোঝবার চেষ্টা করে ভাষাহীন এইসব তরুণ খেলুড়েদের জয় ও পরাজয়ের উল্লাস কিংবা কান্নার কোনো আদিম নিসর্গসঞ্চারী কথোপকথনের বিষণ্ণ বর্ণপরিচয়। রোজ বিকেলে সে প্রাণপণে পরম অনুসন্ধিৎসায় এরকম কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকে, দেখতেই থাকে। বল পায়ে ছোটো একজন, কেউ তাকে তাড়া করে, হঠাৎ সকলে কোথায় যেন দূরে সরে যায়, গোটা মাঠে একা একা ছুটতে ছুটতে তাকে একজন, সামনে শুধু গোলকিপার, অসহায়ভাবে অপেক্ষা করে আছে, শুধু একটু কায়দা করে প্লেস করতে পারলেই বহু - আকাঙ্ক্ষিত গোল– এমন সময় হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে কর্কশ ধ্বনিতে বেজে ওঠে এক অদৃশ্য রেফারির হুইশেল– অফসাইড–অফসাইড– বলে কারা। যেন চিৎকার করে ওঠে ভয়ংকর গলায়। ঠিক এরকমই তো স্বাভাবিক, তার জীবনে এরকমই তো চিরকাল ঘটে এসেছে। এই কথা-না-বলা ও না-শোনার জগতেও মূর্তিমান অভিশাপের মতো তার অস্তিত্বের প্রাচীন। নির্জন নিঃশব্দতা ছিন্নভিন্ন করে দেয় এক অমোঘ ষড়যন্ত্র।

হাঁটতে হাঁটতে টিউকলের সামনে আশ্রমের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে পকেট থেকে সাবধানে আজকের দিনের তিন নম্বর বিড়িতে আগুন জ্বালায় সে। প্রদীপের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। দিনে চারটে বিড়ি রেশন করে দিয়েছে। সকালে পায়খানার সময়, দুপুরে ভাত খাওয়ার পর, বিকেলে এখন আর রাত্রে খাওয়ার পর। সান্টুদার কাছে হিসেব করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। হাতে -পায়ে ধরেও লাভ নেই। ভয় দেখিয়েছে, বেশি লোভ দেখালে একেবারে বন্ধ করে দেবে।

লাল শাড়ি এখন বেগুনি শাড়ি। সন্ধ্যের সজ্জা এখন অনেক বেশি মোহিনী। কলসিতে জল ভরা থেকেও সখীদের সঙ্গে গল্প করতেই মত্ত। কী এত গল্প করে এই মেয়ে? নাকি এরকম কাঁচা বয়সে থাকে প্রাণবন্ত উচ্ছলতা, জীবনের প্রতি প্রচন্ড রকম প্রত্যাশাময় সুখের স্পন্দন।

'তোমার অপেক্ষায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।'

'আমি তো বাপু মাথার দিব্বি দিইনি।'

'একটু কাছে এস, দাঁড়াও এই কদম গাছটার তলায়।'

'কী মিষ্টি গন্ধ গো, চারদিক ম-ম করছে।'

'সেজন্যই তো ডাকলাম তোমায়। একটু দাঁড়াও কাছটিতে, দু'চোখ ভরে দেখি তোমাকে।'

'আমার আর কী দেখবে? আমি কি মাধুরী দীক্ষিত নাকি?'

'তুমি কোথায় থাকো মেয়ে?'

'এই তো কাছেই। যাবে একদিন আমাদের বাড়ি? তবে যাবার আগে তোমার মুখের দাড়িটা কেটে ফেলতে হবে বাপু। দাড়িওলা লোকদের মা ভীষণ ভয় পায়।'

'একদিন তোমাকে নিয়ে গাড়ি করে পার্ক স্ট্রিট যাব। গাড়ি থেকে নেমে তোমার হাত ধরে সোজা ঢুকে যাব বড় একটা হোটেলে। আমার হাতে থাকবে ফাই ফিফটি ফাইভ। সুন্দর একটা টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসব দু'জনে। হাতের ইশারায় ডাকব ওয়েটারকে–'

চারপাশে অন্ধকার হয়ে এল। দূরে গেটের সামনে সদানন্দ আশ্রমের নাম লেখা বড় বোর্ডখানা কেমন ধোঁয়াটে লাগে। মাথার উপরে ছড়ানো আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তার বুকের উপর দিয়ে কেউ বুঝি পা মাড়িয়ে চলে গেছে। চারপাশ ফাঁকা– বড় বেশি শূন্য–ঠান্ডা এক লাশঘর যেন।

তবু মাথা নিচু করে ফিরে আসতে হয়। কাঁদবার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে। আজকে এই বালাচোরা আলো- আঁধারিতে পথ হাঁটতে হাঁটতে বড় বেশি মায়ের কথা মনে পড়ছে। মায়েরা কেন মারা যায়? বাবার কেন হঠাৎ একদিন হার্ট অ্যাটাক হয়? বয়সেও শরীরের আকারে সে সাবালক হলেও, বাস্তবিক পক্ষে সে যে কতখানি অনাথ হয়ে পড়েছে, কাউকে বোঝানোর ক্ষমতা তার নেই।

তবু এই জীবন, এই বোবা-কালাদের শব্দহীন আশ্রম, সান্টুদার অভিভাবকত্ব, প্রদীপের বিবেকের তাগিদ আর সেই মোটা কালো ডাক্তারের খবরদারি– এদের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করে, ছটফটিয়ে কী যেন সে খুঁজে বেড়ায়।

রাত্রিরে খাওয়া-দাওয়ার পরে শেষ কোটার বিড়ি ধরিয়ে মিটিমিটি সাহে সে। আছে আছে সেই লাল শাড়ি আছে। মৃত দেহবল্লরী নিয়ে সে স্মৃতিগুলিকে পাখির মতো উড়িয়ে নিয়ে যায়। কারুকার্যখচিত এই বহুমল্যু চাঁদোয়ার তলায় বিলাসী ভঙ্গিতে শরীর এলিয়ে অন্বেষী চোখে ব্যাকুভাবে চাঁদের তলায় বিলাসী ভঙ্গিতে শরীর এলিয়ে অন্বেষী চোখে ব্যাকলভাবে সে শুধায়, 'এতদিন কোথায় ছিলেন!'